বাংলাদেশের নির্বাচিত কথাসাহিত্য : লোকায়ত ভাবনা

সঞ্জয় সরকার

বৃহৎ বনস্পতির শাখা-প্রশাখাগুলি অরণ্যঘন পরিবেশ সৃষ্টি করলেও, মাটির সঙ্গে শিকড় এক জৈবিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যে বায়োলজিক্যাল থিয়োরিতে গোটা জীবজগৎ আবর্তিত ও প্রভাবিত; তেমনি দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব নির্মাণে প্রতিটি ভাবনার মধ্যেই ফল্গুধারার মতো বয়ে চলে ঐতিহ্য। "পল্লির ঘাটে মাঠে, পল্লির আলো বাতাসে পল্লির প্রত্যেক পরদে পরদে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে।"[১] শুধু পল্লি নয় নগরমুখী জীবন যাত্রাতেও মানুষের রক্ত অস্থি মজ্জায় লোকায়ত ভাবনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগচেতনা যদি সাহিত্যের কাঠামো হয় আর তার ভীত শক্ত করতে ১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যে লোকায়ত ভাবনার বীজ রোপিত হয়েছিল—তারই সংক্ষিপ্ত ফলাফলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ সময় মহীরূহের নীচে থাকলে ছাল-বাকলের গন্ধ তো গায়ে লাগবেই—আর এই মাটির রূপ রস গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই ঔপন্যাসিকেরা তাদের সৃষ্টির মধ্যে কিংবদন্তী, স্থানিক, লোককথা, রূপকথা ও প্রচলিত লোকসমাজের ধারণাগুলিকে নিগূঢ় বন্ধনে শিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সহাবস্থান ঘটালেন। স্বকৃত নোমান (জন্ম—১৯৮০) তাঁর 'হীরকডানা' (২০১৩) উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভাটির বাঘ বীর বাঙালী শমসের গাজী। তাঁর অসামান্য বাহাদুরি ও রণকৌশল এত গৌরবান্বিত হয়েছিল যে তিনি বীর বিপ্লবী ডাকাতদলের সর্দার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি কিংবদন্তী নায়ক তার সম্পর্কে জনগণের ধারণা—"সে রাতে ডাকাতদের সঙ্গে লড়ার সময় শমসের ও সাদুর সঙ্গে নাকি সিংহের সুরত ধরে ডজন ডজন জিনও শরিক হয়েছিল।" (হীরকডানা, পৃষ্ঠা-১৬)

আখতা রুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) এর 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র ভবানী পাঠক। তিনি সন্ন্যাসী আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তার অনেক অসামান্য কৃতিত্বের কাহিনী গুলিকে কেন্দ্র করে স্থানিক কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছিল যা বৈকুণ্ঠের চিন্তায় সেই ভাবনাগুলি ধরা পড়ে। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে বারবেলায় ভবানীঠাকুর এসে বসেন পোড়াদহের মাঠের বটতলায়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সন্ন্যাসী পুজা শুরু হয়। পুজোর পর "সন্ন্যাসী মিলিয়ে যাবে আলোর মধ্যে আলো হয়ে।" (খোয়াবনামা, পৃষ্ঠা-১৬৩)। "....লোকায়ত সংস্কৃতি কালের ব্যবধানে কোনো জাতির শুধু আত্মমুকুব নয় ঃ সংগ্রামশীল চেতনার জন্ম দিতে পারে...."[২] কাৎলাহার বিলের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মধ্যে মুনসি ভাবনার বীজ বিভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। "গোরাদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে সাদাঘোড়া থেকে পড়ে যায় মুনসি। গুলিতে ফাঁক করা গলা নিয়ে সোজা চড়ে বসল পাকুড় গাছের মাথায়। সেই থেকে মুনসি আগুনের জীব।" (পৃষ্ঠা-১৩, খোয়াবনামা)। মুনসি ভাবনার বীজ আরও গভীরভাবে তমিজের বাবার স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) তাঁর 'নাটাই' (২০০৩) উপন্যাসে এক রূপকথার গল্প শোনান আবেদালির ভাবনার মধ্য দিয়ে। বাড়ির পোষা গরুটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে তার চিকিৎসার জন্য আহেদালি তার ছেলে আবেদালিকে নিয়ে যায়। অচেনা জায়গা বনজঙ্গল দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে পোহাদুর দাসীর কাছে শোনা রূপকথাটি মনে পড়ে যায়। রাজার ছেলে ফুলকুমার খুশিমনদের দেশে পৌঁছেছিল। পথে বটতলায় জিরোবার সময় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কাছে শোনে যে, হাঁকড়াই রাক্ষস রাজকুমারী কুসুমবালাকে বন্দি করে রেখেছে। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার মনপুরায় গিয়ে রাক্ষসকে হত্যা করে পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজকুমারীকে নিয়ে রাজ্যে ফেরে। দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে শিশুমনে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার ভাবনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

জলেশ্বরীর মিশনারী স্কুলের ব্রাদার জন দাস তিনি সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয় ছুটির পর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গল্পের আসর বসাতেন। তেমনি একদিন একটি নীতিকথামূলক গল্প শোনালেন—"রাখালের পালে একশোটি ভেড়া ছিল, ঐ ভেড়াগুলির মধ্যে একটি ভেড়া ছিল খুবই দুষ্টু স্বার্থান্বেষী। রাখালবালক সমস্ত ভেড়াগুলি গুনে দেখে তার মধ্যে একটি ভেড়া কম। কিন্তু দুষ্টু ভেড়া জেনেও প্রাণের অন্তঃস্থলে বয়ে যাওয়া ভালোবাসা নিয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। আয়-আয়-আয় বলে ডাকতে থাকে। গল্পটি বলার শেষে জন দাস, সন্ধ্যাদি মবিনের চোখ ছল ছল করে ওঠে" (নারীরা, সৈয়দ সামসুল হক)

সেলিনা হোসেন (জন্ম—১৯৪৭) স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মন-মানসিকতায় যে দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়েছিল। সেই গুরুগম্ভীর পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য "হোজ্জার ছোট্ট পুতুল" উপন্যাসে মোল্লা নাসিরুদ্দিন গল্পের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হলেন। গল্পের শেষে পুতুলটি বলত—"গল্পটি ফুরাল/নটে গাছটি মুড়াল।" (হোজ্জার ছোট্ট পুতুল, পৃষ্ঠা-১২)।

একঘেয়েমি জীবনযাত্রা, সংসার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা পরনিন্দা-পরচর্চা—উপন্যাসের দীর্ঘপথকে নানাভাবে বিদ্ধ করে তার গতিপথকে শ্লথ করে তোলে। আর লেখক ঐ মুহূর্তে বাস্তবসমৃদ্ধ ভাবে রসের জোগান দেন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তা যেন শিশুর বাৎসল্যরস, কচিমুখের হাসি প্রাণ ভরিয়ে দেওয়া শরতের শুভ্র মেঘ। লোকছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা-গীতিকা ও রঙ্গরসিকতা পূর্ণ গানগুলির মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।

'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসে গ্রামে গ্রামে ছড়া কেটে গান শুনিয়ে বেড়াতেন কেরামত আলি। তাঁর মুখে পারিবারিক সম্পর্কের ছড়াটি হল—

"আমার শ্বশুর গেছে তার শ্বশুরবাড়ি।
আরে, শ্বশুর গেছে শ্বশুরবাড়ি
শ্বশুর বাড়ির পানসুপারি
দাঁত নাই তাই খাইতে নারি
মুখেতে মারো হামান দিস্তার বাড়ি।" (পৃষ্ঠা-১৫৫)

লোকসংস্কৃতি ছুৎমার্গ ত্যাগ করে সাহিত্যের ভুবনজোড়া প্যাভিলনে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেছে কালের ধারায়। নির্দিষ্ট কোনো প্রথাগত গণ্ডির মধ্যে আজকে তাকে আর বন্ধ করে রাখা যায় না। তাই মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন রাজাকারদের দমন পীড়ন নীতি সব স্মৃতিগুলি বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভাইরাল ফেবারের মতো প্রবাহিত। কোনো একক স্রষ্টা নয়, সমগ্রের হাতে সেই বীজরোপিত।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) তাঁর 'দূরত্ব' (১৯৭১) উপন্যাসে কলেজ শিক্ষক জয়নাল কলেজের দেওয়ালে ঐ বাস্তব সম্মত শ্লোগানগুলি দেখতে পান—

"মুজিবের রক্ত লাল।
সঠিক পথ চিনে নাও, ধানের শীষে ভোট দাও।
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, রাজাকারে করল শেষ।
ইসলামের নৌকায়; আল-বদর পার পায়।
বুকের রক্ত দিয়েছি তাই—জয়বাংলা ভুলো না ভাই।" (উপন্যাসসমগ্র 'দূরত্ব', পৃষ্ঠা-৮৮)

"চিলেকোঠার সেপাই" (১৯৮৬) উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান ধরা পড়েছে ওসমানের ভাবনায়—

"আইয়ুব শাহী জুলুম শাহী-ধ্বংস হোক।
ধ্বংস হোক"—(পৃষ্ঠা-১২)
"আইয়ুব মোনেম ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই,
জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো।" (পৃষ্ঠা-১৩)

সব ছড়াগুলিই যুগপোযোগী বিশেষ সময়ের তাৎপর্যের নিরিখে উদ্ভব—রাশিয়ান লোকবিজ্ঞানী সকোলভ এই কালচেতনাকে স্বীকৃত দিয়েছেন 'Russian Folklore' গ্রন্থে—"The development of the folk rhymes represents a most interesting process with complete meadering and interesting reflecting with great fullness and diversity both the historical life with its social conflicts and the dialects of class conflict"[৩] সমাজ বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে স্বপ্নপূরণের আশায় রচিত হয় সময়োপোযোগী কিছু ছড়া, যা ঐতিহ্যের সূত্রে বাধা না থাকলেও এত প্রচার লাভ করে যে সেগুলি সার্ব্বজনীন ভাবনার দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। তেমনি ইমদাদুল হক মিলনের (১৯৫৫) "কালোঘোড়া" উপন্যাসে মন্না, খোকা, কাদের ও আলম অত্যাচারী চেয়ারম্যান রাজাকারকে মেরে তারা শ্লোগান দিয়েছিল—

"জয় বাংলা জয়।" (পৃষ্ঠা ৫৫)

লোকছড়ার পাশাপাশি প্রবাদের মধ্যেও সমাজের চালচিত্র ধরা পড়ে। সৈয়দ শামসুল হকের 'নারীরা' উপন্যাসে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের চিত্র ধরা পড়ে। মকবুল ভাই তিনি বুড়ির চরের প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার অধরচন্দ্র ধরের না খেয়ে মরে যাওয়া এবং বর্তমানে সেই অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করে না; কেননা এখন অনেক বড়লোক হয়ে গেছে তাই শোনা যায়—

"রাতারাতি আঙুল ফুলিয়া তারা কলাগাছ" (পৃষ্ঠা-৪৬৭)

প্রবাদের দেশ বাংলাদেশ। তারই আলেখ্য ধরাপড়ে ইমদাদুল হক মিলনের বিভিন্ন উপন্যাসে। তিনি 'নূরজাহান' উপন্যাস ছুনুবুড়ির আধপেটা অবস্থায় পড়ে থাকা, না খেতে পাওয়ার পরিস্থিতিতে যে অভাবের চিত্র ধরা পড়েছে—

(ক) 'সেই দিন নাইরে নাতি
খাবলা খাবলা খাতি।' (নূরজাহান, পৃষ্ঠা-৭৭০)
(খ) 'পেটে খিদা লইয়া মান ইজ্জত দেহন যায়নি।' (নূরজাহান, পৃষ্ঠা-২৩)

মা হামিদা তার রূপবতীকন্যা নূরজাহানকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছে। তাই তার স্বামী দবির গাছিকে বলেছে—

(গ) 'এক মেয়ে যার বারো ভেজাল তার।' (নূরজাহান, পৃষ্ঠা-২২২)

পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংস অত্যাচারের বলি হয়ে ওসমানের মতো হাজার হাজার বিপ্লবীর মুখের ভাষায় যেন প্রবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। আখতারুজ্জুমান ইলিয়াস এর "চিলেকোঠার সেপাই" (১৯৮৬) উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে—(ঘ) 'দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে' (পৃষ্ঠা-২৯)

লোকগাথাগুলি বিশেষ ভাবনার উপর ভিত্তি করে আঠারো দশকে উত্থিত হয়েছিল এবং এর বহুল চর্চিত বিষয় ছিল প্রণয়কাহিনি। অধিকাংশে গাথাই ছিল অলিখিত, লোকমুখে প্রচলিত। যা সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার মধ্যে, এর মধ্যে দুটি পালা হল—(১) "আয়না বিবি" (পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা) ১৯২৫ সালে সংগৃহীত।[৪] এই লোকভাবনার বিষয়কে কেন্দ্র করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেন "আয়না বিবির পালা" (১৯৮২ সাল)। আয়না বিবি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এক নিষ্ঠুর বলি। মামুদ উজ্জ্যাল তার জীবনের ভাগ্যান্বেষণে বন্ধুর চালাকির কাছে নিজের সুন্দর সাজানো সংসারে সন্দেহের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যের করুণ পরিণতিতে আয়না বিবির সতীত্বের কাছে পরাজিত স্বীকার করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল আয়না বিবি। এ যেন প্রেমের জয়গান ঘোষিত হয় গীতিকার বাধাসুরে।

(২) "আঁধা বন্ধু" (পূর্ববঙ্গ গীতিকা) ১৯৩০ সালে সংগৃহীত।[৪ক] এই পালাকে কেন্দ্র করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেন 'আন্ধাবন্ধুর বাঁশী' এই উপন্যাসে লোককথাকার মনসুর বরাতির সঙ্গে জমিদার ভগ্নী চাঁদ সুলতানার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রণয়। যে চাঁদ সুলতানা চরিত্রের ছাপ আবার মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। ঘটনাচক্রে জমিদার দাদারা জানতে পেরে ফিরোজ দেওয়ানের সাথে বোনের বিবাহ দেন। অন্যদিকে মনসুর বয়াতিকে এমন বিষ পান করান, যাতে করে সে বেঁচে থাকে কিন্তু চিরজীবনের মতো বাক্‌রুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ফিরোজ দেওয়ানের মধ্যস্থায় চাঁদ সুলতানা ও মনসুর বয়াতির মিলন হয়। "গ্রামীণ এক আবহ তাঁর সৃজিত কথাশিল্পের শরীর সমানে দাপাদাপি করেছে।"[৫]

"যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্য রচিত ও লোকসমাজে কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোকগীতি বলে।"[৬] বাংলার নদী মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস মুখরিত করে গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া সেই সমস্ত লোকগীতিগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন ঔপন্যাসিকেরা। তাই আবেগের মূর্চ্ছনায় ইমদাদুল হক মিলনের 'নূরজাহানে'র মূল চরিত্র মজনু পদ্মার অপরূপ সৌন্দর্যের মাধুর্যে নূরজাহানের মধ্যে খুঁজে পায়; পদ্মার সেই গভীর উপলব্ধি

"অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে।" (পৃষ্ঠা-৭৪, নূরজাহান)

সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৯৪৭), "হাঙর নদী গ্রেনেড" উপন্যাসে বুড়ির বাল্যসখী নীতা বৈরাগী। তার সন্ন্যাসীনি জীবনের নানা দুঃখের স্মৃতি রয়েছে। সেই দুঃখগুলি দোতারা বাজিয়ে গেয়েছে—"কঠিন বন্ধুরে/সুখে না রহিতে দিলা ঘরে/সাজাইয়া পাগলের বেশ/ঘুরাইয়া দেশ-দেশান্তরে/সুখে না রহিতে দিলা ঘরে—" (হাঙর নদী গ্রেনেড পৃষ্ঠা-২২)

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'নারীরা' উপন্যাসে মকবুল ভাই এর মাধ্যমে—"শুনেছিলাম কানাট্যাংড়ার কথা। সে গাইত গান, আমাদের উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া।" জলেশ্বরীর

আকাশভরা বিলাপবাহিত সেই গান—

"কত আগুন জ্বলে রে বন্ধু
কত আগুন জ্বলে
প্যাটের আগুন, মনের আগুন
চুলার আগুন, ভিটার আগুন
প্যাটের আগুন বড় আগুন সর্বলোকে বলে
রে বন্ধু কত আগুন জ্বলে।"
(শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ঃ সৈয়দ শামসুল হক; পৃষ্ঠা-৪৬২)

বাস্তবতার দলিলে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত করে গেছেন কথাসাহিত্যের মধ্যে নিবিড়জীবন দর্শন।

বাস্তবতার পাশাপাশি গ্রাম্যভাবনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন বিশ্বাস সংস্কার, সর্বপ্রাণবাদ, আদিম কুলদেবতা, গোত্র বাধানিষেধ ও জাদু বিশ্বাস। এমনই এক বিশ্বাস সংস্কারের চিত্র ধরা পড়ে 'দূরত্ব' নামক উপন্যাসে। যেখানে গ্রামের কিষাণ বৌ পাশের বাড়িতে আগুন আনতে গিয়েছিল—"গ্রামে সূর্যাস্তের পর অনেকেই আগুন ধার দেয় না।" (পৃষ্ঠা-১১)। তাই একটি অভিনয়ের মাধ্যমে কিষাণ বৌ আগুন চুরি করেছিল। 'খোয়াবনামা' তে হুমায়ুন তার মা হামিদার কাছে পরীক্ষার আগে। "মা, আজ ডিমভাজা দিয়া ভাত দিবা না মা?" শূন্যের সঙ্গে ডিমের সম্পর্ক থাকায় তাকে ডিম খেতে দেয়নি।

'নূরজাহান' দরির গাছি খেজুরগাছকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ভক্তিশ্রদ্ধানিবেদন করে থাকেন—"মা মা গো....এই দুইন্নাইতে তোমার ছাড়া আমার মিহি চাওনের আর আছে কে? তোমরা দয়া না করলে বাচম কেমনে।" (পৃষ্ঠা-১৬) গাছের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদের অস্তিত্ব খুঁজেপান দরিরগাছি।

Myth বা পৌরাণিক প্রসঙ্গ 'কালোঘোড়া' উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মিষ্টির দোকানদার রতনলাল ব্যবসার প্রসার জমানোর ভাগ্যনির্মাতা হিসেবে তার বোবা মেয়ে কালীর অবদান প্রসঙ্গে—"কালী হইল গিয়া মা লক্ষ্মী। কালী কাইল মিষ্টি না পাইয়া মন খারাপ করছে। হের লেইগা এই সর্ব্বনাশ। হায়! হায়, কী করলাম। লক্ষ্মী মা গো কিরপা করোমা।" (কালোমোষ, পৃষ্ঠা-৩৮) আবার তিনি অদৃষ্টের চিন্তায় "মাইনষের কপাল খারাপি আছে, সব কুলক্ষণ।" (পৃষ্ঠা-৯১), এর থেকে মুক্তি দিতে পারে মা কালী "কালীর হাতের পুতুল" (পৃষ্ঠা-৮৪) সবাই। অন্যদিকে 'দূরত্ব' উপন্যাসে মৃত্যু সম্পর্কে গ্রামের' মানুষের মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছি তারই ব্যাখ্যা স্বরূপ চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়া মন্তব্য করেছেন—"আল্লার আমলে দুই কিসিমের জীব আছে। একটি মাটি দিয়ে তৈরি; আরেক আগুন দিয়ে তৈরি।....জন্তুটা সেই আগুনওয়ালাদেরই কেউ কিনা।" ('দূরত্ব' পৃষ্ঠা-৬১)

ভূত ও ভৌতিকতা কথাসাহিত্যের এক রোমাঞ্চকর ভাবনার রস যা পাঠকদের মধ্যে বিতরণ হয়। তেমনি একটি সূত্র ধরা পড়ে মমিনের দৃষ্টিতে। সাবিত্রীর সঙ্গে যে বাঁশবাগানের পরিচয় সূত্র লাশকাটা ঘর তাই থেকে তার উপলব্ধি—"অপমৃত্যু হলে তো মানুষ ভূত হয়ে যায়। "সেইসব ভূত বাঁশবনে থাকে।....বাঁশের ঝাড়ে মট মট শব্দ হয়।....আঙুল মটকাচ্ছে ভূতেরা। আঙুল মটকে বলছে—আঁয়, আঁয়, তোদের খাঁবো।" (সৈয়দ সামসুল হক উপন্যাস সমগ্র "গল্প কোলকাতার", পৃষ্ঠা-৫২১)। এই সময়ের অন্যান্য উপন্যাসে জিনের ভাবনা পেত্নি জাদুবিশ্বাস (খোয়াবনামা), তেনাদের প্রসঙ্গ

(চিলেকোঠার সেপাই), অশরীরী আত্মার প্রসঙ্গ, স্বকৃত নোমানের 'হীরকডানা।' প্রসঙ্গগুলি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মাণে বিশেষবার্তাবহী।

ভূতে ধরলে যেমন ওঝার চিকিৎসা আছে তেমনি ভয় পেলে পানিপড়া (জলপড়া) নিত্যনতুন চিকিৎসার বর্ণনা পাওয়া যায়। লোকসমাজ তখন সুচিকিৎসক হয়ে ওঠে। 'নূরজাহান' উপন্যাসে হামিদা মুরগির বাচ্চা পোলেতে আটকে গেলে তার আঘাতগ্রস্থ পায়ের চিকিৎসা করছে—"হলুদ চুন কতটা কাজ করছে কে জানে। বাঁচিয়ে রাখা যাবে ছাত্তটাকে" (নূরজাহান পৃষ্ঠা-১১৩)। শওকত আলী'র 'নাঢ়াই' (২০০৩) আহেদালি ও তার পুত্র আবেদালি অসুস্থ গরুর চিকিৎসার জন্য—"কবিরাজের বাড়ি পর্যন্ত ওটাকে সে নিতে পর্যন্ত পারবেনা?" (পৃষ্ঠা-১৭) বোধহয় এমন সংশয় দেখা দিয়েছে। 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) সেলিনা হোসেন বুড়ির ছোটবেলার দুরন্তপনা খেলাগুলি করার পর হাত পা কেটে গেলে "শিয়ালমুখা দাঁতের তলে, চিবিয়ে লাগিয়ে দিত। রক্ত বন্ধ হয়ে যেত।" ('হাঙর নদী গ্রেনেড, পৃষ্ঠা ২৮)। আবার বুড়ির বন্ধ্যাত্ব কাটানোর জন্য "ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, তুমার গাছ গাছালির ওষুধ সবই তো হল" (পৃষ্ঠা -২৬)। এতে ক্ষান্ত হয়নি "শুরু হয় গ্রামের টোটকা ওষুধের ব্যবহার।" (ঐ)

স্মৃতির রোমন্থন ও বিনোদনের মাধ্যমে হিসেবে লোকক্রীড়াগুলি উপন্যাসে বিশেষ ব্যাঞ্জনা নিয়ে আসে। জমিদারি শাসনকালে পতুর্গীজ দস্যুদের অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য উত্তরসূরী শামসের গাজীর মধ্যে জগন্নাথ সেন উপলব্ধি করলেন "কুস্তিখেলা, লাঠিখেলা এবং তীরধনুক চালনায় পটু হয়ে উঠছে দিন দিন" (হীরকডানা, পৃষ্ঠা-১৫)। সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড' বুড়ির ছোট্টবেলায় সাঁতার খেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত সোনা ও রূপা দুই বোন, তাই সোনার ভাবনায় আবার পুতুল খেলার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে—"পুতুলের বিয়ে দেব। পুতুলের ঘরে যদি ব্যাটা হয় শঙ্খে ফুঁক দেব, বেটি হইলে গলা তার টিপিয়া ধরিব।" (সৈয়দ শামসুল হক, উপন্যাস সমগ্র, পৃষ্ঠা-৪৭০) এই খেলাগুলির মধ্যে সমাজ বাস্তবতার দিকটিও লক্ষ্যণীয়।

পরম্পরা গৃহশেলী, কৃষিকাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, রান্না ও খাবারের মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের ঐতিহ্যের যোগসূত্র বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। চেরাগ আলি কুলসুমকে বলেছিল "দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের রাজা,/পুরদুয়ারি তাহার প্রজা" (খোয়াবনামা, পৃষ্ঠা-২৩)। মামুদ উজ্জ্যাল ও আয়না বিবির নতুন সংসারে গৃহনির্মাণের যে চিত্র ধরা পড়ে "আটচালা চৌচালা ঘর বাঁধে সে,...শীতলপাটি বোনে আয়না বিবি, সেই শীতলপাটি দিয়ে ঘরের বেড়া হয়, উলুছনের সোনায় ঘরের চাল ঝাক ঝাক করে ওঠে, মাছরাঙা পাখির পালক দিয়ে দুয়ারের দু'পাশ সাজায়।" (আয়না বিবির পালা, পৃষ্ঠা-১৭৪) লোকশিল্পীর নিদর্শন ফুটে ওঠে। কৃষিজীবনের ব্যবহৃত একাধিক জিনিসের নাম উল্লেখিত হয়েছে কৃষক চাঁদবেনের মুখে—"নিড়ানি রেখে আলের ধারে বসে পড়ে—ও মাথালটা ঠিক মতো বেঁধে নেয়" (সেলিনা হোসেন, চাঁদ বেনে, পৃষ্ঠা-১, ৮) "গোলাভরা ফসল।....তার ঢেঁকি ঘরে ঢেঁকির পাড় কখনোই বন্ধ হবে না" (ঐ)। "এরা মূলত সেই কৃষিজীবী সম্প্রদায় (Peasants) যারা অতীতের বিশ্বাস, সংস্কার ও শিল্পকে ঐতিহ্যের ধারায় বয়ে নিয়ে আসছে।"[৭] "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" খাদ্য দেখে বাঙালি চেনা যায়। বাঙালির প্রিয় খাবার ভাত; সেই ভাত খেতে যে বিভিন্ন

তরকারি নূরজাহানের মা হামিদা—চ্যারা সুটকির ভর্তা (পুঁটি মাছের সুটকি), ইলশা মাছের কলসা ছোবার ভর্তা, লুকা (নাড়ি ভুড়ি ভাঁজা); মউলকা (চালগুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে গোলা চাপাটি) 'নূরজাহান,' পান্তাভাত, মুড়ি, খড়, চিঁড়ে পিঠে, পুলি খাবারের বর্ণনাগুলি এই সময়ের কথাসাহিত্যে ফুটে ওঠে।

'ছায়াঢাকা গাঁয়ের মাটির মসজিদ/সুবেলা আজান প্রাচীন মন্দির/উলুধ্বনি কীর্তন গাজনের গান, পুরনো/গির্জার ঘণ্টা, প্রণত প্রার্থনা... লালহাল খাতা, হাওয়াই মিঠাই/ চিনি হাতি-ঘোড়া, কুমোরের চাকা/মাটির পুতুল, ঢেঁকিতে গাঁয়ের বধূ/নাগর দোলার ঘূর্ণি, রাতভোর যাত্রাপালা/ লালনের গান....মাঠের কিষাণ, জারি/সারি, কবিগান"[৮] —বিষয়গুলি নিয়েও যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, তার প্রমাণ দিলেন কথাসাহিত্যেকেরা নিত্যনতুন চিন্তা-ভাবনার নিরিখে। মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন মাতৃভাষাকে, যে ভাষার বর্ণনাধারায় ফোয়ারায় বাষ্পীয় জলোচ্ছ্বাস নেওয়ার জন্য চোখ চেয়ে থাকল ওপার বাংলার দিকে।

তথ্যসূত্র

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'বাংলা সাহিত্যের কথা'
২. শাফিক আফতাফ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাসে স্থানিক সংস্কৃতি (ইতিহাস ঐতিহ্য, প্রবন্ধ) www.natunckmatra.com
৩. সম্পাদনা ড. সত্যবতী গিরি, ড. সমরেশ মজুমদার, প্রবন্ধসঞ্চয়ন, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১১ (পৃষ্ঠা-১০৬)
৪. ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৬ (পৃষ্ঠা-৪৮০)
৪./ক (ঐ) (পৃষ্ঠা-৪৮১)
৫. কামারুজামান জাহাঙ্গীর, লোকায়ত এক উপন্যাসের গল্প (Arts.bdnewas 24.com)
৬. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলার লোকসাহিত্য
৭. শেখ মকবুল ইসলাম, লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১ (পৃষ্ঠা-৩৯)
৮. মুহম্মদ সামাদ, আমি তোমাদের কবি, ২০১৮ (Arts, bdnews.24.com)